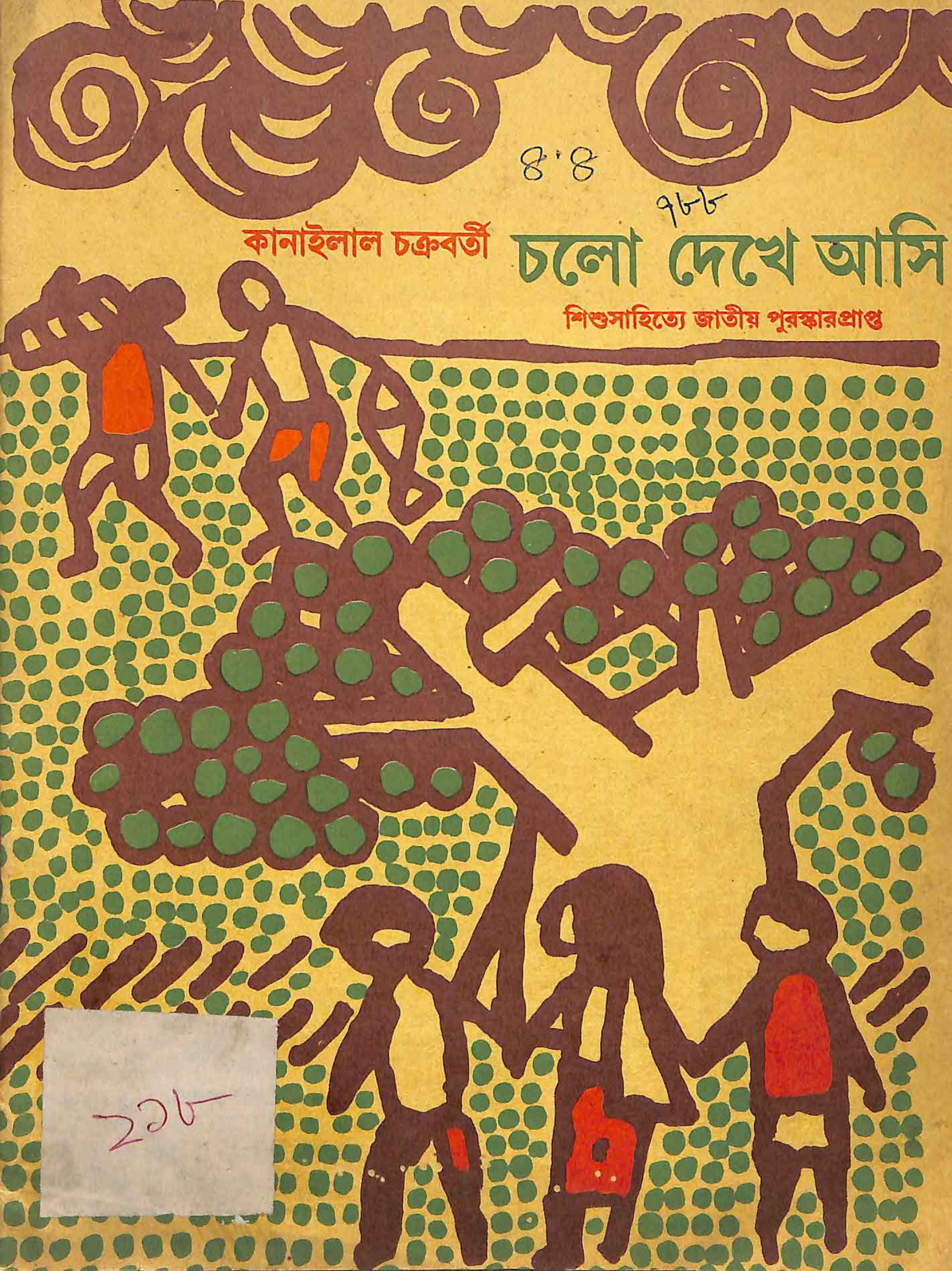
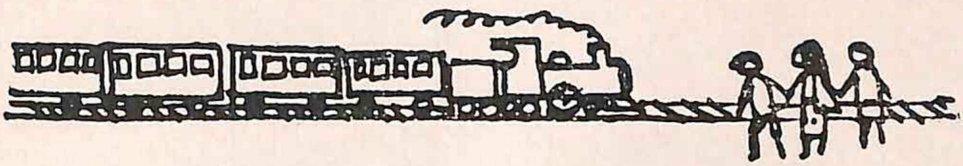


কানাইলাল চক্রবর্তী

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

চলো দেখে আসি



কানাইলাল চক্রবর্তী

স্বর্ণাক্ষর
পরিবেষক : দে বুক স্টোর

প্রথম প্রকাশ : ১৯৭০
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৭৬

প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ (৩০০০ কপি)
জানুয়ারি ১৯৮৮

দ্বিতীয় মুদ্রণ (৫২০০ কপি)
অগাস্ট ১৯৮৮

ছবি এঁকেছেন
রঘুনাথ গোস্বামী (১৮টি) পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় (৯টি)
প্রচ্ছদ শিল্পী
পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক
শিশির চক্রবর্তী
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৯/১ এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০০১৯

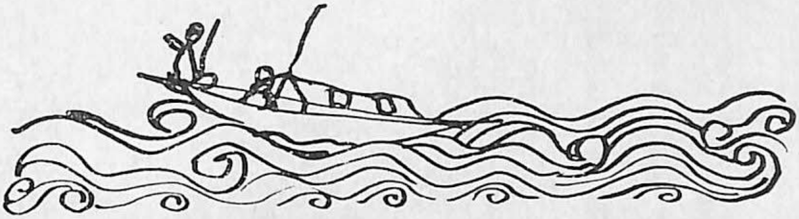
মুদ্রক
প্রতিক্ষণ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১২-বি, বেলেঘাটা রোড
কলিকাতা-৭০০০১৫

পরিবেষক
দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

দাম : ৬ টাকা

ও-কার ('ধোপা এসেছে' ইত্যাদি) অংশ থেকে সর্বত্র অনুজ্ঞা-বাচক শব্দে ও-কার ব্যবহৃত হয়েছে। যথা : চলো, দেখো, রাখো ইত্যাদি। ও-কার শেখার আগে পর্যন্ত 'চল' 'বল' ইত্যাদি বানান লেখা হয়েছে। চন্দ্রবিন্দু প্রায় গোড়া থেকেই আছে। চন্দ্রবিন্দু অংশে পৌঁছবার আগে এর উচ্চারণ শিশুদের শিখিয়ে নেওয়া যেতে পারে : খোকাকে কে কাঁদায়, সে কাদায় পড়ে গেছে ; রাম একা হাঁটে, আমি হাটে যাই—এই সব উদাহরণের সাহায্যে। —লেখক

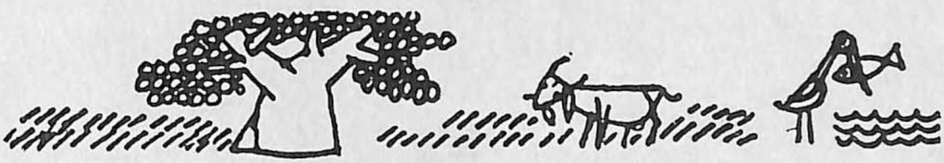
বাঙালীর ঘরে যত ভাই-বোন,
চলো দেখে আসি। পথ কম নয়।



প্রথম পাঠ



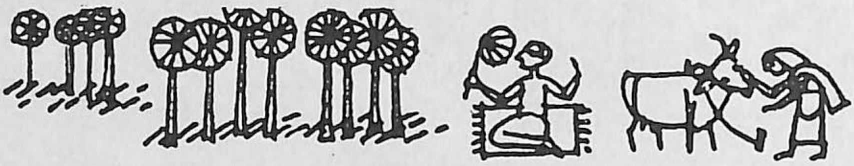
এস, এস । চটপট কর । সময় কম । কখন ঝড় বয় । ঘন বন । পথ কম নয় । অজয় বড় নদ । ঐ জল এল ।



বটগাছ । কত ছায়া । বড় বড় তার পাতা । ছাগলছানা বটপাতা খায় । আর খায় নরম ঘাস । ছাগলছানা ধরা যায় না । ওরা লাফায় ।

শাদা বক মাছ খায় । আর মাছ পায় না । তাই ওরা বাসায় যায় । সারা রাত আর খায় না ।

এখন বিকাল। কত পাখি। সারি সারি তালগাছ। তালপাতায় পাখা হয়। তিন আনা দাম। যদি চাও, এই লও একখানি। তিন মাস হাওয়া খাও।

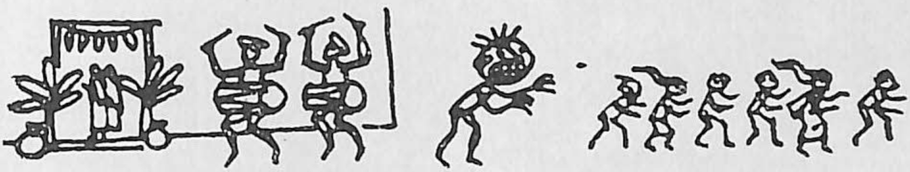


মিনিমাসির একটা গাভী ছিল। ভারী আদর করত। ডাকত মালিনী। তার গা ছিল শাদা। একদিন নীল আকাশ লাল হল। পিপীলিকা উড়ল। মালিনীর ভীষণ ভয় হল। দড়ি ছিঁড়ল। আর এল না।



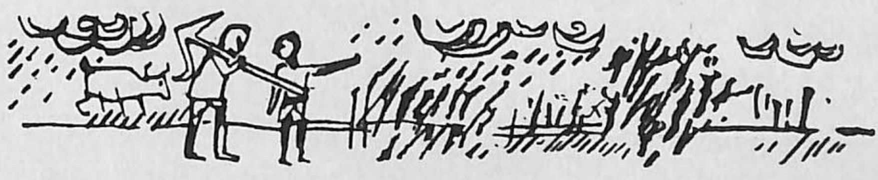
দুপুর। হু-হু হাওয়া। গাছ-ভরা কুল। লালু আর ভুলু কিছু কুল পাড়ল। হঠাৎ ভুকু হাজির। ভুকু লালুর কুকুর। ভুকু কুঁই-কুঁই

করল। লালু একটা কুল ছুঁড়ল ভুকুর মাথায়। ভুকু বার-দুই শুঁকল কুলটা। তারপর দিল ছুট। কুলগুলি ছিল টক।



পূজা হল। খুব ধুমধাম। কত ধূপ পুড়ল। তারপরই পুতুলনাচ। চূড়ামণি ঠাকুর করল আরতি।

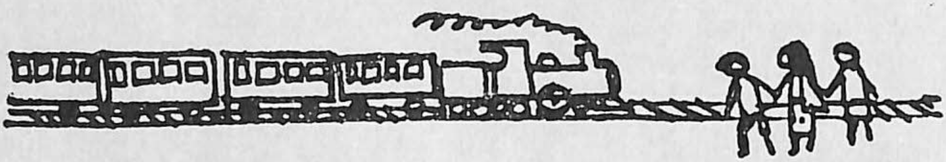
আরও মজার কথা। ভূষণমালী চুন-কালি মাখল। সাজল ভূত। খুব ভয় হল। চুপি চুপি সব পালাল।



ঋষি দাশ কৃষক। এ বছর খুব জল হল। ঋষি দাশ বলল, এবার

কৃষিকাজ করব। ধান বুনব। পাট লাগাব। আরও ফলাব শশা, পটল, বরবটি।

ভৃগুরাম তার ভাই। সে বড় কৃপণ। তার ঘরবাড়িও পৃথক। মৃণালিনী তার বউ। তার হৃদয় দয়ায় ভরা।



বেলতলায় মেলা বসেছে। রেলপথের বেশ কাছেই। কে কে যাবে, সাবধানে যেও। নিজেদের হাত ধরে থেক। রেলের বাঁশি শুনলে দূরে সরে দাঁড়াবে।

গাঁয়ের অনেকে রেলে চড়ে আসে। নানা রকম জিনিস কেনাবেচা করে। মেয়েরা মেটে হাঁড়ি কেনে। বেনে মশলা কেনে। ছেলেমেয়েরা ঘুরে ঘুরে দেখে। মেলার শেষে বাঘের খেলা দেখে ঘরে ফেরে।

সীতেশ যেখানে যা দেখে, তার খাতায় লিখে রাখে। সীতেশ, তুমি কি এই মেলার কথা লিখবে?



বৈশাখে শৈলর বিয়ে। ঐ সময় বিনুবৈরাগীর আসা চাই। নৈহাটিতে ওদের দেখা। ঐখানে বৈকালে শৈল তার গান শুনত। হাতে একতারা, পরনে গৈরিক বসন। কৈ, বৈরাগীকে কেউ যে খবর দিলে না। কৈখালির মৈনাক কি তাকে চিনতে পারবে?



ধোপা এসেছে। ছোটখোকাকে বলো, জামা-কাপড়গুলো দিয়ে দিক। তার ময়লা মোজাটাও দেয় যেন। ভোলা বুঝি দোকানে গেছে। রোজ ভোরে ছোলা না হলে ওর চলে না। ওতে নাকি মোটা হওয়া যায়।



রামপদর বড়ই দুঃসময়। দুঃসাহসই ওর দুঃখের কারণ। বার বার কারবার ফেল করে টাকাকড়ি নিঃশেষ হয়ে গেছে। অভাবের তাড়না দিন দিন দুঃসহ হয়ে উঠেছে। এখন বাড়ি যাবে ঠিক করেছে। ওর কথা শুনে দুঃখ হয়।



পাঁচ-সাত দিন আগেও হাঁসের ছানাগুলি কত ছোট ছিল। এখন সাঁতার কাটে। ঠোঁট দিয়ে খুদ-কুঁড়ো খুঁটে খায়। কেঁচো পেলে খুশি হয়। ভোঁদড় দেখলে পিঁক পিঁক করে ডাকতে থাকে। চাঁপার মা বাঁশ নিয়ে তেড়ে আসে। তাই দেখে ভোঁদড় পালায়।



ছোটখুকিকে মৌমাছি কামড়েছে। গৌরময়রা ভালো ঔষধ জানে। ভৌমিকদের বাড়ির সামনে তার দোকান। দৌড়ে যাও। পৌরসভার পাশ দিয়ে যাবে। গৌণ করবে না। সৌরীনকেও আসতে বোলো।



ভয়ংকর একটা বিষধর সাপ। কালো মিশমিশে রং। ভারী হিংসুটে ওরা। তাড়া কোরো না যেন। আঘাত পেলে দংশন না করে ছাড়বে না। শংকরকে বলো, বরং বেদেপাড়ায় সংবাদ দিয়ে আসুক। তারা ধরে নিয়ে যাবে। কংসারি ভালো সাপ ধরতে জানে।

দ্বিতীয় পাঠ



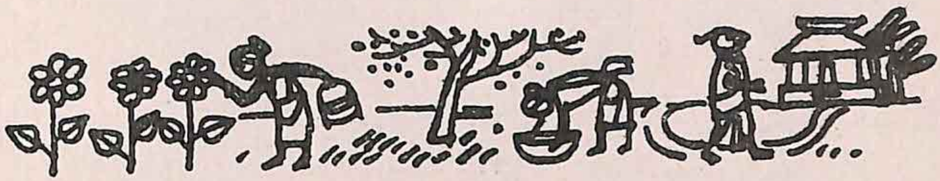
চলো বলরাম মাঠে যাই। মাঠে ধান পেকেছে। সোনার মতো রং। চাষীর মুখে হাসি। মাঘ মাসে ধান বেচে শীতের জামা কিনবে।

ধান থেকে চাল হয়। চাল থেকে ভাত। মা ভাত রাঁধে, আমরা খাই।



লিলি লিখতে পারে না। সারাদিন কালি-কলম নিয়ে কী-সব খেলা করে। আমি যদি লিখি, ও খিল খিল করে হাসে। মিছিমিছি হাসি কি ভালো ?

মীরাকে বলো, তার বীণাটা আজ একজন নিয়ে গেছে। খুব দীন চেহারা লোকটার। কালই আবার এসে দিয়ে যাবে। কিংবা মীরা নিজেও যেতে পারে। নদীর তীর ঘেঁষে তার বাড়ি। তবে শীত বেশি হলে একা যাবে না। বীরবলকে নিয়ে যাবে। ধীরে ধীরে যায় যেন। সমীর বলে গেল, পথে ভীষণ ভিড়।



ফুলগুলি তুলে আনো। কুল-দেবতার পূজা হবে। চূড়ামণি ঠাকুর আসছেন। এক ঝুড়ি বেলপাতাও এনে রেখো। গুরুদাসকে বলো, মুড়ি-মুড়কি নিয়ে আসুক। পরে ভুলে যাবে। রামতনু উলুপুর থেকে আসবে। কিছু কুল আনতে বলেছি। বুলুকেও নিয়ে আসবে। উলু দেওয়ায় তার খুব শখ। শাঁখে ফুঁ দিল কে ? মধুর লাগল না তো। আসছে বছর সাগর থেকে আমি নতুন শাঁখ এনে দেব। আর আনব রঙিন ঝিনুক।



অমৃত ঘৃতে লুচি ভাজছে। কৃপানাথের মেয়ের বিয়ে। এটি তৃতীয়। মৃত পিতা নৃপতির কথাটা মনে আছে। নৃপতি বলেছিলেন, কৃপণ হয়ো না। মেয়ের বিয়ে একটু খরচ করেই দিও। তবে দেখো, বৃথা খরচ যেন একটুও না হয়।



বেশ শীত। জলে যেন বরফ গলেছে। গাছের পাতা ঝরে গেছে। গত বছর এ-সময় এত শীত পড়েনি।

দেশে গিয়েছিলাম। খেজুর রস খেয়েছি। গুড়ের নাড়ু খেয়েছি। আর খেয়েছি টাটকা শাক-সবজি। চমৎকার সেখানকার



মিঠে আলু আর হলদে রঙের পেঁপে। গাছেও পেকে থাকে। দেখে চোখ জুড়োয়।

পথ-ঘাটও শুকিয়ে এসেছে। মাঠের ধান কাটা শেষ। সকালে ভিজে ঘাসের মাথায় মাথায় নানা রঙের ফড়িং উড়ে বেড়ায়।

পাড়াগাঁয়ে ঘর-বাড়ি গাছপালায় ঘেরা। সকালে অনেকক্ষণ মাটি ভেজা থাকে। শীত যেন ছাড়ে না। বেশ লাগে। আসছে বছর আবার যাব।



বৈশাখ যায়-যায়। আজ ঝড় জল হবে। ঐ দেখ, আকাশ কী-রকম কালো হয়ে উঠল। ঝড় বইল। আকাশ ভেঙে নামল জল। মাঠ-ঘাট একেবারে থৈ থৈ। ঐ যে, কই মাছ লাফিয়ে ডাঙায় উঠল।

জল দেখে ছেলেমেয়েদের হৈচৈ আর থামে না। তাদের কৈলাসকাকা এতে রাগ করেন। শৈশবে তিনি নাকি কখনই ঐরকম করতেন না।

এত জল! হৈচৈ না করে কি থাকা যায়? জল যেন ছুটছে। এসো, নৌকো ভাসাই।

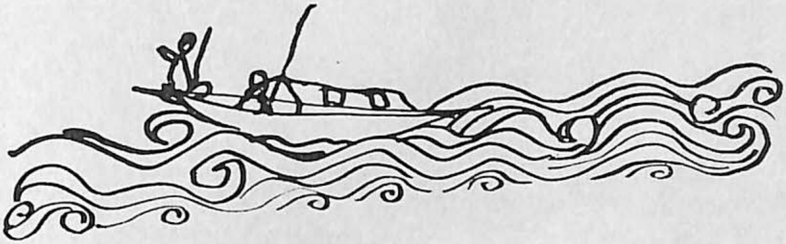


কাল ভোরে বোলপুর যাব। ওখানে ছোটকাকা থাকেন। সোমবার বোলপুরে উৎসব। শোরগোল পড়ে গেছে। ভোজ হবে, ঢাক ঢোল বাজবে, বাউলগানও হবে। কোনও কিছুর অভাব নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নাচবে গাইবে। মনোযোগ দিয়ে শোনবার মতন।

ওবারে একটা শোলার পুতুল কিনেছিলাম। লোকনাথ কোথায় হারিয়ে ফেলেছে। এদিকে কারও কাছে বলেওনি। লোকে বোকা ভাববে তাই।

দৌলতপুরে গৌরীদের মামাবাড়ি। নৌকোয় চড়ে যেতে হয়। একবার পৌষ মাসে গিয়েছিলাম। পৌষ মাসে নৌকো বেশি দোলে না। ভারী ভালো লেগেছিল।

দৌলতপুরে আরেকবার গিয়েছি। গৌরীর নতুন বৌদির বৌভাতে। নদীতে খুব ঢেউ। পৌঁছতে রাত হয়েছিল। নৌকোর দুলুনি আজও মনে আছে।



বংশীলালের বিয়ে। কনের বাড়ি পালং। লামডিং জংশন থেকে যেতে হয়। ডাকবাংলোর পাশ দিয়ে পথ। পথের কতক অংশ কাঁচা। ইদানীং গরুর গাড়ি চলে।

কনের বাবা রঙের কারবার করে। ছোট কারবার। চিংড়িহাটায় তার দোকান। কোনও রকমে সংসার চলে। বিয়েতে কিছু খরচ করবে না। তবে আংটি আর কিছু অলংকার তো দিতেই হবে। ঘর-দোর রং করাও বাকি।

অনিঃশেষবাবু আমার কাছে দুঃখ করে গেলেন। তাঁর ছোট ছেলেটা নাকি একেবারে অধঃপাতে গেছে। দিনে দিনে যেরকম দুঃশাসন হয়ে উঠছে তাতে আর আশা করার কিছু নেই। ছেলেই অনিঃশেষবাবুর শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছে। আমার মনে হয়, শহরের আবহাওয়া ওর পক্ষে ভালো নয়। ওকে কিছুদিন পাড়াগাঁয়ে কোথাও রাখলে ভালো হয়। সেখানকার সরল চাল-চলন আর মিঠে জল-হাওয়া ওর মনঃপূত হবে। লেখাপড়ায় মনঃসংযোগ হবে। কথাটা কাল বলব ভেবেছি।



পাঁচকড়ি চাঁদপুরের লোক। এখন শাঁখারিপাড়ায় থাকে। দাঁতের মাজন তৈরি করে। ওর দাঁতের রোগ ছিল। পুঁজ পড়ত। ঠোঁট খুলে হাসতে পারত না। এখন দাঁত তুলে ফেলে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছে।

তৃতীয় পাঠ

পৌষ মাস। কনকনে শীত। বড়দিনের ছুটি। ছেলেরা চড়ুইভাতি করবে। চৌধুরীদের বাগানবাড়ি ঠিক করেছে। বড় বড় আমগাছ। শাল শিমুলও আছে। ডাল-পালায় রোদের লুটোপুটি দেখবার মতন।

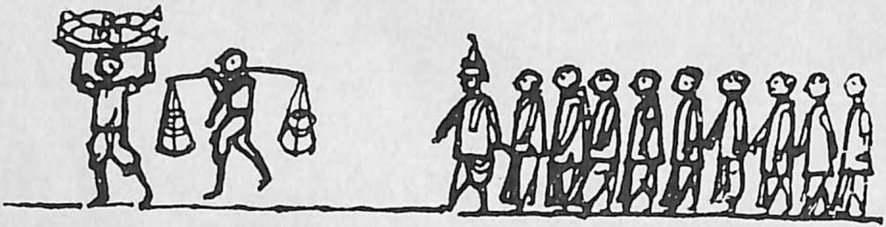
ছেলেদের কী উৎসাহ! ভোলা ঘাড়ে করে কাঠ আনছে। অপু আনছে মাছ আর ডিম। টমেটো লাল টুকটুকে। চাটনি হবে। আর আসবে দই।



শালপাতায় খাবে। থালা-বাসন লাগবে না। হরিদাস হাঁড়ি-কড়াটা মেজে দেবে। সে পেট ভরে খাবে আর আট আনা পয়সা পাবে। বারো টাকা চাঁদা উঠেছে।

বিকেলে লুকোচুরি খেলা। আমগাছের আড়ালে কে? কেউ না—একটা শেয়াল দৌড়ে গেল। আমলকী গাছের ডাল নড়ছে। ওখানে কে? পাখি বসল। শিস দিল কে? বাতাস। কোথায় একটা কোকিল ডাকল না? কোকিল না—অমল। অমল কোথায়? সাড়া নেই।

হলধর বড় বড় মাছ এনেছে। কাৎলা, চিতল, রুই। ছোট মাছও আছে—পারশে, পুঁটি, চিংড়ি, টেংরা। জিওল মাছ কিছু আছে কিনা দেখো। কই বা শিঙি থাকলে রেখে দাও। বাবলাকে কদিন শুধু ঝোল-ভাত দিতে হবে। কবরেজমশাই বলেছেন।



হলধরের সাথে দরদাম কোরো না। ওর মতন সৎ লোক আজকাল বড় দেখা যায় না। বাপের নাম রেখেছে। ওর বাবা কাঙালিচরণ খুবই সৎ ছিল। ভালো কথা, হলধরকে বলে দাও, আষাঢ় মাসে ঝুমুর বিয়ে। মাছটা ওকেই দিতে হবে। বড় খোকা বলেছে সব জিনিস ভালো হওয়া চাই। দই দেবে চাঁদখালির দিনু গোয়ালা। তার চিনিপাতা দই চমৎকার। লোক কম হবে না। চার-পাঁচশোও হতে পারে। বরের বাড়ি থেকে কতজন আসবে তা না জেনে হিসাব করা ঠিক হবে না।

বড় খোকা বলেছে ঝুমুর বিয়েতে সে নিজেও কিছু খরচ করবে। না করলে তার দুঃখ থেকে যাবে। কী কী দেবে তার একটা তালিকাও সে করে ফেলেছে। একটা সোনার সিঁদুরকৌটো, রুপোর কাঁটা, পাথর বসানো আংটি, আর একখানা দামি বেনারসি শাড়ি। এতে তার ঋণ করতে হবে না।



কলকাতা বড় শহর। অনেক লোকের বাস। অতনু সেখানে থাকে। কলেজে পড়ে। অনেকদিন তার খবর পাইনি। আজ লোক পাঠাব। নিরাপদ যাবে। বৌমাকে বলো চিঠি লিখে দিক। ঠিকানাটা ভালো



করে লিখে দেয় যেন। কিছু আমের আচার আর গুড়ের মোয়াও দিয়ে দিতে বলো। অতনু হাতঘড়িটা ফেলে গেছে। সেটাও দিয়ে দেয় যেন। দম দেওয়া আছে তো ?

ঝড় জলের দিন। নিরাপদকে একটা ছাতা কিনে দিও। কত আর দাম। সাত-আট টাকা হবে।

কলকাতায় গাড়ি-ঘোড়ার ভিড়। দৌড়-ঝাঁপ করে না যেন। দেখে শুনে চলতে হবে। পথ-ঘাট হারিয়ে ফেললে বিপদে পড়বে।

সময় পেলে হিমাংশুকে দেখে আসবে। সে অতনুর খুব কাছাকাছি থাকে। পটে ছবি আঁকে।

নিরাপদ যেন কালই ফিরে আসে। বাগবাজারের টাটকা ইলিশ এক জোড়া আনতে বলে দিও। পুরুত ঠাকুর সাধ করে খেতে চেয়েছেন।

কাল রথ। পুরুত ঠাকুর খাবেন। বৌমাই রাঁধবে। ঠাকুর ছুটি নিয়েছে। বৌমা ভালো রাঁধে। তারাপদর পৈতার সময় অত লোক খেল, বৌমাই রেঁধেছিল। খেয়ে সকলেই খুশি। অমন পায়েস আর খাইনি।

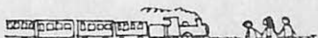
আষাঢ় মাস। আকাশ মেঘে ঢাকা। কালো মেঘ। সারাদিন ঝিরঝিরে হাওয়া আর গুঁড়ো গুঁড়ো জল। একে বলে ইলশেগুঁড়ি। ইলিশ মাছ ধরবার দিন।

নদীতে ইলিশ মাছ ধরা দেখতে বেশ লাগে। ছোট ছোট নৌকোয় চড়ে জেলেরা টানা জাল ফেলে দেয় নদীতে। নৌকো ভেসে চলে



জলের টানে। জালে মাছ পড়লে জালের মুখ আটকে দেয়। তারপর ধীরে ধীরে টেনে তোলে নৌকোয়। শাদা চকচকে ইলিশ মাছ। দু-তিন বার লাফায়। তারপর মরে যায়। ডাঙায় ইলিশ মাছ বাঁচে না।

একবার খুব বড় এক জোড়া ইলিশ দিয়েছিল শীতল জেলে। দাম নিয়েছিল আট আনা। নতুন মামী শখ করে রেঁধেছিলেন সেদিন। ভাজা, ঝোল আর ডিম দিয়ে টক। কী মজা করেই না খেয়েছিলাম আমরা। দাদামশাই খেতে খেতে বলেছিলেন, হাটে ও-মাছ টাকায় পাঁচটাও পাওয়া যায়। তবে শীতলকে তো আর আট আনার কম দেওয়া যায় না।



একলা একটা পাখি দূর থেকে ডাকছে না ? সে কি এই দিকেই উড়ে আসছে ? চলো, দেখে আসি ।



হঠাৎ মেঘ ডাকল না ? এখন তো মেঘ ডাকার সময় নয় ! চলো, দেখে আসি ।

খেতে ফসল কাটছে কৃষক । কুমোর মাটি মাখছে । জেলে জাল ফেলছে নদীতে । চলো, দেখে আসি ।

নদীতে দাঁড় পড়ছে ছপ্‌ছপ্ । চলো, দেখে আসি । নদীতে আলো পড়ছে । নদীতে ছায়া পড়ছে । চলো, দেখে আসি ।

বইয়ের কথা

সবে যারা অক্ষর চিনেছে এ-বইতে তাদের নিয়েই লেখক বেরিয়ে পড়েছেন—কত কী দেখবার আছে, কত কী শোনবার—লেখক যেন তাঁর খুদে পাঠকদের সঙ্গে ক'রে সমস্তই দেখাচ্ছেন ও শোনাচ্ছেন ; কথা বলছেন তাদের সঙ্গে এমন ভাষায় যা অন্যের সামান্য একটু সহায়তায় তারা নিজেরাই পড়তে পারবে। ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি এখানে-সেখানে, একথা-সেকথায়, সমস্তই ছবি হয়ে উঠছে টুকরো রচনাগুলিতে। এভাবেই তিনি শিশুদের মন টেনে রাখেন। টেনে রাখেন এতটাই যে এই সব দেখা-শোনার সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা যে আসলে বাংলা ভাষাই দেখে ও শোনে, আস্তে আস্তে চিনে নেয়—তা পর্যন্ত তাদের খেয়াল থাকে না। ছোট ছোট এক-একটি রচনা-টুকরো পেরিয়ে এসে এক-একটি বানানও শিখে যায় তারা, আ-কারের পর ই-কার তারপর ঈ-কার—এইভাবে 'ঔ-কার পেরিয়ে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত। এক কথায়, রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ'-এর পর বাংলা ভাষায় এটিই বোধ হয় একমাত্র বই যা ভাষা শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আনন্দে ভরে তুলবে শিশুদের মন।



লেখকের কথা

নিজের যখন ষাট বছর বয়েস তখন একদিন ছোটদের ডেকে বললেন—

একলা একটা পাখি দূর থেকে ডাকছে না ? সে কি এই দিকেই উড়ে আসছে ? চলো, দেখে আসি।
হঠাৎ মেঘ ডাকল না ? এখন তো মেঘ ডাকার সময় নয় ! চলো, দেখে আসি।
খেতে ফসল কাটছে কৃষক। কুমোর মাটি মাখছে। জেলে জাল ফেলছে নদীতে। চলো, দেখে আসি।

ছোটদের নিয়ে ছোটদের জন্য এরকম কত কথাই যে তিনি লিখেছেন তার শেষ নেই। এরকমই কিছু লেখা রঘুনাথ গোস্বামীর আঁকা ছবি সহ ১৯৬৭ সালে 'সারস্বত প্রকাশ' পত্রিকায় ছাপা হওয়ামাত্র চারদিকে শুরু হল উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। পরে সেই লেখার সঙ্গে আরো লেখা নিয়ে হল এই বই—চলো দেখে আসি। ১৯৭০ সালে বাংলা ভাষায় ছোটদের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে এটি জাতীয় পুরস্কার পায়।

সেই থেকে ১৯৮৫র মে পর্যন্ত কানাইলাল চক্রবর্তী আনন্দমেলা, ছোটদের পাততাড়ি, ছেলেবেলা, কাটুম-কুটুম, তাল-তমাল প্রভৃতি পত্রিকায় লিখেছেন নানা ধরনের গল্প, ছড়া, কবিতা। লিখেছেন নিজের ছেলেবেলার হাজারদুয়ারী দুনিয়ার কথা। ছেলেবেলার বন্যা, পুজোর মোষ বলি, গ্রামের খালে হাঙর শিকার, ইষ্টকুটুম আর বউ কথা কও পাখির জন্মকথা।

১৯৮৫র ২৬ মে ছোটদের এই লেখক তাঁরই ছড়ার পক্ষিরাজের পিঠে চড়ে—

নদী পেরল, মাঠ পেরল, ছুটল মেঘের দেশে
জল যেখানে তুলো হয়ে বেড়ায় ভেসে ভেসে।